ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

ফিচার-১৯

আগরতলা,১৬ ফেব্রুয়ারি,২০২৪

বই, আধুনিকতায় ও সংস্কৃতিতে

।। অশোকানন্দ রায়বর্ধন।।

অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ তার নিজের মনের ভাবকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার প্রয়াস চালিয়ে গেছে। পাহাড়-পর্বতের গায়ে, গুহাগাত্রে চিত্রাংকনের মাধ্যমে তার মনের ভাবকে স্থায়ী রূপ দিয়ে গেছে। ক্রমান্বয়ে মানুষ ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ভাষাকে গ্রহণ করেছে। মৌখিক ভাষার মাধ্যমে মানুষ খুব সহজে মনের ভাব প্রকাশ করতে পেরেছে। এই সাফল্য অত্যন্ত লক্ষণীয় হলেও মৌখিক ভাষা বা কথা স্থায়ী নয়। কথা নশ্বর। এই কথাকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য, অবিনশ্বর করে তোলার জন্য মানুষ সেদিন আবিষ্কার করেছিল লিপি। তবে লিপির এই ইতিহাস এত প্রাচীন যে কিভাবে মানুষ লিপির আবিষ্কার করেছিল সে তথ্য আজকের দিনে সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বর্তমানের বিজ্ঞানের যুগে, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির কারণে প্রাচীন লিপির নানা নিদর্শন দেখে লিপি বিশারদগণ লিপি সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। তাঁদের গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে আনুমানিক পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে মানুষ লিপির ব্যবহার শুরু করে। প্রথমদিকে লিপি ছিল চিত্রলিপি। ছবি আঁকার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করা হত। একসময় এই চিত্রলিপির পর্যায় অতিক্রম করে মানুষ নতুন এক ধরনের লিপি আবিষ্কার করল। এই লিখনপদ্ধতির নাম ভাবলিপি। এই পদ্ধতিতে একটি মাত্র ছবির মাধ্যমে একটি মাত্র বিষয়কে না বুঝিয়ে একটা বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করতে লাগল। তা থেকে ধীরে ধীরে অক্ষরলিপির উদ্ভব হয়। একসময় তা থেকে আধুনিক ধ্বনিলিপিরও সৃষ্টি হয়।

লিপিবিশেষজ্ঞগণ প্রাচীন কয়েকটি সভ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে লিপির ব্যবহার ও ক্রমোন্নয়ন চলছিল। প্রাচীন এশিয়া, পারস্য, মিশরসহ সব সভ্যতায় লিপির ব্যবহার ছিল। সেই অনুযায়ী প্রাচীন কয়েকটি লিপির কথা জানা যায় সেগুলো হল– সুমেরীয় লিপি, মিশরীয় লিপি, সিন্ধুলিপি, খরোষ্ঠী লিপি ও ব্রাহ্মী লিপি। অধিকাংশ লিপীবিশারদগণ মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতকে ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব হয়েছিল। এই ব্রাহ্মীলিপি থেকে খ্রিস্টপূর্ব দুশো অব্দে কুষাণ লিপির উদ্ভব হয়। কুষাণ লিপি থেকে সৃষ্টি হয় সিদ্ধমাতৃকা লিপি। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের দিকে সিদ্ধমাতৃকা লিপি থেকে সৃষ্টি হয় কুটিল লিপির। এই কুটির লিপি থেকে অষ্টম শতকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন লিপির জন্ম নেয়। সেরকম পূর্ব ভারতে সৃষ্টি হয় গৌড় লিপি বা প্রত্ন বাংলা লিপি। এই হিসেবে পন্ডিতগণের মতে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে বাংলা লিপির জন্ম হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ লেখার প্রয়াস চালিয়ে গেছে। নানা প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপাদানে মানুষ লিখতে চেয়েছে। মানুষের সেইসব লিখনসামগ্রীগুলো হল– (পাথর, তুঁত, বট, নিম ইত্যাদি) গাছের বাকল, (কলা, তাল, ভুজ ও অন্যান্য) গাছের পাতা, প্যাপিরাস ঘাস, কাঠ, পোড়ামাটির ফলক বা ইট, তুলা ও রেশমজাত বস্ত্র, হাতির দাঁত, জীবজন্তুর চামড়া (পার্চমেন্ট ও ভেলাম) ধাতু (সোনা, রুপা, তামা, সিসা, পিতল, টিন ইত্যাদি) কচ্ছপের খোল ও কাগজ।

২-এর পাতায়

প্যাপিরাস শব্দ থেকে এসেছে পেপার। বাংলায় কাগজ। এই কাগজের জন্ম যিশুখ্রিস্টের জন্মের একশো বছর পর আনুমানিক একশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে চীনারা কাগজের ব্যবহার শুরু করে। কিন্তু কাগজের বই তৈরি হতে সময় লাগল আরো পাঁচশো বছর। ছয় শতাব্দীর দিকে চিনারাই প্রথম হাতে লেখা বই প্রকাশ করে। আরো আট-নয়শো বছর পরে পনেরো শতাব্দীতে জন্ম নিল ছাপাখানা। তারপর থেকে ঘটে গেল এক নীরব জাগরণের পর্যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, জার্মানির গুটেনবার্গ সাহেব তাঁর প্রেস থেকে প্রথম ছেপে বের করেছিলেন বাইবেলের কয়েকটি অধ্যায়। গুটেনবার্গের ছাপাখানা আর তাঁর প্রথম ছাপা বই বাইবেল দিয়ে সারা বিশ্বে বইয়ের ব্যাপক যাত্রার সূত্রপাত ঘটে। তারপর থেকে সভ্য মানুষের জীবনে অপরিহার্য হয়ে গেছে বই। আধুনিক মানুষ তার অর্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভূতিগুলিকে ধরে রাখতে চেয়েছে বইয়ের মধ্যে।

জ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম মাধ্যম হলো বই। বই জন্ম নেওয়ার পরেই ক্রমে ক্রমে তার সৌষ্ঠবে অনেক উন্নতি ঘটেছে। তেমনি গড়ে উঠেছে ছোটো বড়ো বহু গ্রন্থাগার। বই নিয়ে আধুনিককালে বিশ্বব্যাপী বিপণনেরও একটা পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। বই নিয়ে সংস্কৃতি, জ্ঞানচর্চা আর বাণিজ্যের এক সুন্দর মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়েছে আজকের দিনে।

মানুষের জীবন যখন কর্মচঞ্চল্য আর ব্যস্ততায় পূর্ণ সেই সময়ে জীবনে প্রাণের ও আনন্দের হিল্লোল বয়ে আনে উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই মানুষ মানুষের কাছাকাছি আসে। তারই ফলশ্রুতিতে স্থান দখল করে নেয় মেলা। মেলা আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ। মেলা বাঙালির সংস্কৃতির প্রাণস্বরূপা। মহামিলনের ভূমি। মেলার মাধ্যমে একসময়ের কর্মব্যস্ত বাঙালিজীবন পেয়েছে জীবনেরই সঞ্জীবনী মন্ত্র ও প্রাণশক্তি। একদিন এরকমই একটি মেলাকে কেন্দ্র করে সারা বাংলায় দেখা দিয়েছিল নবজাগরণের প্রথম লহর। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা তথা ভারতের সাধারণ জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার জাগরণ সৃষ্টির এবং জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্রিটিশ ভারতে আয়োজন করা হয়েছিল একটি মেলার। ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসে ঠাকুর পরিবারের ও রাজনারায়ণ বসুর সহযোগিতায় নবগোপাল মিত্র 'হিন্দু মেলা' (১৮৬৭-১৮৯৯) প্রতিষ্ঠা করেন। চৈত্রসংক্রান্তির দিন হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এটি চৈত্রমেলা নামেও পরিচিত ছিল। এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় মেলা ও স্বদেশী মেলা নামেও পরিচিতি লাভ করে। আর এই মেলার ভুবনে প্রিয়জনসান্নিধ্যব্যাকুল সভ্য মানুষের আধুনিক সংস্করণ হল বইমেলা। শিক্ষিত মানুষের বেঁচে থাকার রসদ হল বই। বই দর্পণের মতো। সেখানে সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। সভ্যতার সত্যচিহ্নকে তুলে ধরে বই। আর বইকে নিয়ে মেলা শুধু বইয়ের মেলা নয়। কোন পশরার মেলা নয়। এ এক প্রাণের মেলা আত্মার সঙ্গে আত্মার মেলবন্ধন ঘটে এখানে। আর এই মিলনের মাধ্যমে মানুষের বিভেদ দূর হয়ে যায়। সংকীর্ণতার বন্ধন কেটে যায়। আধুনিক সংস্কৃতির উদার ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে আসে বইমেলা।

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ঐতিহ্যের প্রতি বৃষ্টির দিলেও আমরা দেখি যে প্রথমেই একাধিক ধর্মগ্রন্থ শুরু হয়েছে পাথরে বা ফলকে খোদাই করে পরবর্তী সময়ে তা বই হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে গ্রন্থ বা বই যে মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেন তার প্রমাণ হল বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহকে বলা হয় পবিত্র বই। যেমন হিন্দুদের গীতা, ভাগবত মুসলমানদের আল-কোরআন, খ্রিস্টানদের বাইবেল, শিখদের গুরুগ্রন্থ সাহেব ইত্যাদি গ্রন্থকে পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে শ্রদ্ধা করা হয়। এছাড়াও হিন্দু সংস্কৃতিতে গ্রন্থ বা পুস্তককে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

৩-এর পাতায়

জ্ঞানের দেবী বা বিদ্যার দেবী হিসেবে সরস্বতীর আরাধনা করা হয়। দেবী সরস্বতী শুভ্রবর্ণা। তাঁর একহাতে বাদ্যযন্ত্র ও অন্যহাতে থাকে বই। জ্ঞানের প্রতীক বই দেবীর হাতে শোভা পায়। দেবীর প্রণাম মন্ত্রে উচ্চারণ করা হয় বইয়ের কথা–

নমো সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে।।
জয় জয় দেবী চরাচর সারে কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে।
বিনা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে ভগবতী ভারতী দেবী নমোহস্তুতে।।

বই যে অধ্যয়নের জন্য, এমনি ফেলে রাখার জন্য নয় সে নির্দেশও আমরা পাই সুক্তিরত্নমালায়– পুস্তক স্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্। / কার্যকালের সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম।। বইয়ের মধ্যে বিদ্যা (পুঁথিগত বিদ্যা) এবং পরের হস্তগত ধন (পরাধীন ধন) সময়ের প্রয়োজনে কাজে লাগেনা।

বাঙালির লৌকিক আচারেও দেখা যায় যে, সরস্বতী পূজার সময় দেবীর উপাচারের পাশে বইও রাখা হয়। পূজার শেষে দেবীর আশীর্বাদী ফুল, দূর্বা শ্রদ্ধা সহকারে বইয়ের পাতার ভাঁজে রেখে দেওয়া হয়। এছাড়া বই মাটিতে পড়ে গেলে বা পায়ে লেগে গেলে তা তুলে শ্রদ্ধার সঙ্গে কপালে বা মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করা হয়। আমাদের শৈশবে দেখেছি পাঠ্যবই সংগ্রহ করা খুবই দুষ্কর ছিল। কোন ভাবে দু একটি বই সংগ্রহ হলে অন্য সহপাঠীরা তা থেকে টুকে নিয়ে নিজেরা পাঠ প্রস্তুত করত। বইয়ের স্বল্পতার কারণে শ্রেণীকক্ষ থেকে অনেক সময় বই চুরি হয়ে যেত। সেটা এড়ানোর জন্য অনেকে বইয়ের পাতায় নিষেধাত্মক ছড়া লিখে রাখত এরকম এই প্রতিবেদকের স্মরণে থাকা একটি ছড়া এখানে উল্লেখ করছি–

আমার বাবা গিয়াছিলেন ঢাকা
সঙ্গে নিয়েছিলেন টাকা
টাকা দিয়া কিনলেন বই
আমার বই আমার সই
এই বই যে করিবে চুরি

তার গলায় পড়িবে ছুরি—ইত্যাদি। যাতে বইয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কথা নিহিত থাকে এবং শ্রদ্ধেয়বস্তু চুরি না করার ট্যাবুও কার্যকর হয়।

পরিশেষে এ কথাই বলা যায় যে বই আধুনিক যুগের ফসল হলেও তা সুদূর অতীতকাল থেকেই আমাদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে বই আজ আমাদের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। তাই কবির ভাষায় বলতে হয় –

হেথায় মিশেছে দিশি দিশি হতে বিপুল জ্ঞানের ধারা,
শত মনীষীর চিন্তার বাণী, আনন্দে আকুল পারা।

*****